প্রসঙ্গঃ অভিজিত রায়ের “আত্মা নিয়ে ইতং বিতং”

ধর্ম নিয়ে বেয়ারাপনা আমার ছোটবেলা থেকেই। ধর্ম একটি গৌণ ব্যাপার। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষ ধর্মের প্রতি দূর্বল হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েই গেল। বাবা মারা গেলেন ১৯৮৯ এর চৌদ্দই জানুয়ারী। শ্রাদ্ধ এখনো করিনি। বাবা গত উনিশ বছর ধরে পুৎ নরকে আমার জন্য হা-পিত্যেস করছেন। পুৎ নামক ন্রক থেকে মুক্ত করার জন্যই ছেলের আর এক নাম পুত্র। আমি তাঁর শ্রাদ্ধ করব, তবেই তো তাঁর নরক মুক্তি। বাবার কপাল খারাপ। আমার জন্য বসে থাকলে তাঁর নরক মুক্তি কোন দিন হবে না।

বাবা নিয়মিত চিত্রগুপ্তের সাথে দেখা করেন। চিত্রগুপ্ত একই জবাব দেন। তোমার ফাইলে সবই তো পরিষ্কার। ঐ একটাই বাকী। ওটা ছাড়া তো তোমাকে ছাড়তে পারি না বাপু। পনের দিনে শ্রাদ্ধ করতে হয়, আর তোমার ছেলে ব্যাপারটি এতগুলো বছর ফেলে রেখেছে? ভারী নিমক হারাম ছেলে তো তোমার। তুমি ওকে বল কাজটি সেরে ফেলতে, নচেৎ তোমার ছেলের ফাইল এখনই ওপেন করে একটা লাল ফ্ল্যাগ দিয়ে রাখব। বাছাধন মজা বুঝবে সময় হলে। বাবা বলেন, আমার ছেলে ভারী ঘাঁওড়া। ও আমার শ্রাদ্ধ করবে না। ওর কাছে শ্রাদ্ধের কোন মূল্য নেই। চিত্রগুপ্ত বাবাকে এতদিন যাবত দেখছেন। ক্রমেই বাবার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন। বলেন, তুমি ওর সাথে কথা বল। দরকার হলে আমিও বলব। উত্তরে বাবা বলেন, কিভাবে বলব? আপনারা তো পৃথিবীর সাথে এখনও টেলি যোগাযোগ স্থাপন করেন নি।

চিত্রগুপ্ত বলেন, তাহলে সবাই যেভাবে করে, সেভাবেই কর। তোমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সব খুলে বল। বাবার সাথে স্বপ্নে অনেক বারই কথা হয়েছে, কিন্তু শ্রাদ্ধের কথা একবারও বলেননি। কারণ বাবা ভাল করেই জানেন, এটা বলে কোন লাভ নেই।

তবে বাবার জন্য একটা ভাল সম্ভাবনা আছে। তা হল, চিত্রগুপ্তকে যথারীতি বিরক্ত করে যাওয়া। বাবার ধৈয্য পরীক্ষায় সন্তোষ্ট হয়ে অহেতুক নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে বাবাকে একটা ভাল পজিসনে চাকরী দিয়ে দিতে পারেন। চিত্রগুপ্ত একদিন অবসর নেবেন। সেই সময় বাবা হয়ত চিত্রগুপ্তের চেয়ারটাই পেয়ে যাবেন। তখন সারা পৃথিবীর লোক চিত্রগুপ্তের নাম ভূলে বসন্ত কুমার সরকারকে শ্রদ্ধার সাথে মনে করতে থাকবে। চিত্রগুপ্তের খাতার স্থলে পৃথিবীর তাবৎ লোক বলবে বসন্তকুমারের খাতা। এই পৃথিবীতে বসন্তকুমারের ছেলে হিসেবে আমিও সেলিব্রিটি ধরনের একটা কিছু হয়ে যাব। মৃত্যুর পরে বাবার সহাকারী হব। মানুষ তোষামোদ করতে শুরু করবে। তখন অনেককেই নরক থেকে স্বর্গে ঢুকিয়ে দিতে পারব। বাবাকে বলব, ইনি আমার ‘আপনা’ লোক, বাবা। নামে-বেনামে প্রচুর কামিয়েছে। সুইচ ব্যাংকেও প্রচুর টাকা রেখে এসেছেন বটে। কিন্তু মন্ত্রী থাকাকালীন আমাকে অনেক লাইসেন্স-পারমিট ধারিয়ে দিয়েছেন। ওকে সরাসরি স্বর্গেই দিয়ে দাও।

আত্মা কি? ছোটবেলায় পড়েছি, এই নশ্বর পৃথিবীতে আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার বিনাশ নাই। ইহা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ফেলিয়া নূতন বস্ত্র ধারন করে, আত্মাও তাহাই করে। আত্মা শত-সহস্র যোণী পরিভ্রমন করে। পূর্ব জন্মে ভাল কাজের জন্যই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। আবার এই জন্মে খারাপ কাজ করিলে পোকা-মাকড়-কেচু কিম্বা বিচ্ছু কিম্বা ফড়িং হইয়া আকাশে আকাশে উড়িতে হইবে। এইসব মুখস্থ করে পরীক্ষায় একশতে একশত নম্বর পেয়েছি। বড় হয়ে সেই আত্মা খুজে বেড়িয়েছি। আত্মার খোজ কখনো পাইনি। তবে অভিজিত রায়ের আত্মা নিয়ে ইতং বিতং কথনে আত্ম তত্ব ও তথ্য ক্রমাগত পরিস্কার হচ্ছে। হাঁওমাঁও খাঁও আঁত্মার গঁন্ধ পাঁও।

ডঃ অভিজিত রায়ের জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষণ অতি চমৎকার, সুখপাঠ্য, এবং অসাধারণ। ভাষা এবং রচনাশৈলীতে সমৃদ্ধ। বাংলাভাষায় এ এক নতুন সংজোযন। প্রতিটি বাংলাভাষীর জন্য "আত্মা নিয়ে ইতং বিতং" অবশ্য পঠনীয়।

জন্মিলে মরিতে হইবে, অমর কে বা কবে। কাজেই আত্মারও মৃত্যু নেই, কারন এর জন্মই তো নেই। অত্যন্ত সহজ। মস্তিস্কের বিশেষ কোষের কার্যক্রম যখন নিঃশ্বেসিত হয়ে আসে তখন মস্তিস্ক দেহের উপর তার নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলে। দেহের মৃত্যু ঘটে। তথাকথিত অস্তিত্বহীন আত্মা নাকি দেহ ছেড়ে পলায়ন করে। কোথাও কুত্তা-বেড়াল পেলে তার উপর চড়াও হয়। মনে হয় পূর্ব জন্মে সব কুত্তাই মানুষ ছিল। মানুষের আত্মা নিয়ে এই বিশেষ প্রানিটি মানুষের অনুগত বিশ্বস্ত ভক্তে পরিনীত হয়। খ্রীস্টানদের আত্মার কি দশা হয় জানিনা। তবে মুসলমানের আত্মা সরাসরি আল্লাহর কাছে চলে যায়। সব মুসলমানের পূনরায় জন্ম হবে হাশরের ময়দানে। আল্লাহ প্রত্যেকের আত্মা ফিরিয়ে দেবেন। সবাই তখন কাতারে দাঁড়াবেন। একটি নয়, দুটি নয়। বাহাত্তর খানা কাতার। কমর উদ্দিন স্যার (কন্ডু ডাক্তর) প্রতি সপ্তাহে হাশরের গল্প বলতেন। হাশরের ময়দান বলতেই হাই স্কুলের মাঠের দৃশ্য চোখে ভেসে আসত। প্রস্থ হাই স্কুলের মাঠের প্রস্থের মত হলেই চলবে। কিন্তু দৈর্ঘ্যটা কত হবে? প্রতি কাতারে কত লোক দাঁড়াবে? তখন ছোট ছিলাম। পৃথিবীটাও ছোট ছিল। এখন অনেক কিছুই ভাবতে হয়। সারা পৃথিবীর লোক সংখ্যা কত? এই মুহূর্তে গুগল বলছে – ৬,৭৭৭,১০৬,৪১৫ জন। সাতশত কোটি ছুঁই ছুঁই করছে। কত সহস্র কোটি লোক এর মধ্যেই মারা গেছেন। গুগল বলছে প্রতি বছরে মারা যাচ্ছে - ৫,৭৯০,০০০ জন। এভাবে মানুষ মরতেই থাকবে। এ দুনিয়া ফানা হবে – কিছুই রবে না। যখন পৃথিবীটা সত্যি ফানা হবে, তখন প্রতিটি কাতারে মোট কত লোক দাঁড়াবে? এত বড় অংক আমার মাথায় কিছুতেই আসছে না। তবে এটা ঠিক, প্রতিটি কাতার (সারি) কয়েক খানা সৌরমন্ডলের এপাশ-ওপাশ ছাড়িয়ে যাবে। কাতারের সংখ্যা বেশী করতে পারলে ভাল হত।

আত্মার কথায় ফিরে আসি। আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে বিচরন করে। হিন্দু গবেষকরা এর প্রমানও দিয়েছেন। উনিশ শত সত্ত রের শেষ কিম্বা আশির প্রথম দিকে এক গবেষ ক আবিষ্কার করেছেন যে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে লম্ফ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। আগের জন্মের লোকটার খানিকটা (মেমরি) মগজও বহন করে নিয়ে যায়। তাঁর গবেষনার এক আট বছরের ভারতীয় বালিকা নাকি নিউয়র্কে তার পূব জন্মের বাড়ীখানা সনাক্ত করতে পেরেছে। আর এক লোক নাকি পূব জন্মের আত্মীয়দের ঠিক ঠিক চিনতে পেয়েছেন, নাম-ধাম বলেছেন। বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের পশুচিকিৎশা অনুষদের অধ্যাপক হাফিজুর রহমান ভারতে কোন এক বিজ্ঞান সম্মেলনে গেলে জায়গাটি নাকি তাঁর চেনা চেনা ম্ নে হয়েছে। অনেক আগে সেখানে ছিলেন বলে মনে হয়েছে। আর এক জনের কথা জানি। তাঁর এক মাত্র ছেলের মৃত্যুতে তিনি ভেংগে পড়েননি। তিনি বিশ্বাস করেন, ছেলে মরেনি। অন্য দেহ ধারন করেছে মাত্র। হয়তো হরদমই নিজের ছেলেকে দেখছেন। কিন্তু এখনো চিন্তে পারেন নি। দেখা হবেই একদিন। সেই অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু মিলন হবে ক্ত দিনে, তার মনের মানুষের সনে।

এই জিনিষ গুলো ভারতের বাজারেই চলে। যেমন আমেরিকার বাজারে চলে UFO কিম্বা ৫০০ পাউন্ড ওজনের নব জাত শিশু ইত্যাদি। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, এইযে অনেকে দাবী করছেন, অজানা-অচেনা জায়গায় পূর্ব জন্মের সূত্র ধরে কাউকে চিনতে পারছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নাকি আগাম নাম ধাম বলতে পারছেন। এসবের ব্যাক্ষা কী হতে পারে? ডঃ রায়, আত্মা নিয়ে এতং বিতং এর কোন পর্বে কি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন?

মন জটিল বস্তু। এই বস্তুটি কিভাবে কাজ করে? একেক জনের আচরন একেক ধরনের। নিয়ন্ত্রক কোষগুলোর প্রকৃতির ভিন্নতার কারনে কি? ধর্ম কিভাবে মানুষকে অন্ধ করে? মস্তিষ্কের কোষে এমন কি ঘটে যার জন্য হামেশাই আত্মঘাতী বুমারু (Suicide Bomber) হতে এতটুকু দ্বিধা করছে না? কিসের ভাবাবেগে অগনিত নির্বোধ অমূল্য জীবনটাকে ধূলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে?

মস্তিষ্কে এমন কি ঘটে যার জন্য মানুষ ধর্মান্ধ হয়? ১৯৮৩-৮৪ এ জাপানের শুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি আন্তর্জাতিক গবেষক হিসেবে কাজ করি। পাঁচ মাইল দূরে শুচিওরা নামে এক ছোট্ট শহরে প্রায়ই যেতাম ওইন্ডো শপিংয়ে। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারীর এক শীতের সন্ধ্যা। ফেরার পথে বাস স্ট্যান্ডে এক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হই। প্রধান রাস্তা থেকে ছোট একটি রাস্তা ভিতরে চলে গেছে। তারই মাথায় দাঁড়িয়ে পুস্তক-পুস্তিকা বিতরন করছে আটাশ বছরের এক জাপানী তরুণ। গায়ে নামাবলী, পড়নে ধূতি। বরফ গলা প্রচন্ড শীতের সন্ধ্যা। তার সাথে এলোপাথারি বাতাস। বাতাসে ধূতি বারবার সরে যাচ্ছে, আর সমগ্র ডান পা ক্ষনে ক্ষনে বেড়িয়ে আসছে। কৌতুহলী হয়ে কাছে গেলাম। নাম জিজ্ঞেস করতেই বলল 'শ্রীচরণ দাস' গোছের এক ভারতীয় নাম। তার জাপানি নাম জানতে চাইলাম। হাসি দেখে মনে হল, বলতে চাইছে না। তুমি কি হিন্দু – জানতে চাইলাম। উত্তর - না। আমি দ্বিধান্বিত। ও বুঝল, আমি নিজে হিন্দু, অথচ জানিনা কেন আমি হিন্দু। ভারতীদেরকে কেন হিন্দু বলা হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ দিল। সেই প্রথম জানলাম আমি কেন হিন্দু। দেশে ফিরে আমার ছাত্রদেরকে এই ঘটনা বলেছিলাম। এক তব্লিগ ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলতো তুমি কি? বিনা সংকোচে উত্তর, আমি হিন্দু, কিন্তু ধর্ম অনুসারে মুসলমান। শ্রীচরণ দাস প্রভূপাদের একখানি বই হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। বইটির একজায়গাতে লেখা তাঁকে অনুসরণ করলে পৃথিবীতে কোন অশান্তি থাকবে না। এরপরে আর পড়ার দরকার হয়নি।

কিসের তাগিদে এই শ্রীচরণ দাস তার জাপানি সুন্দর জীবনযাপন ছেড়ে প্রচন্ড শীতে ধূতি পড়ে পুস্তক বিলি করছে? তার মস্তিষ্কের কোন কোষে কিষের প্রভাব পড়ছে? অনিশ্চিত পরপারে বাহাত্তুর জন সুন্দরীর হাতছানি কিভাবে অনেককে স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য প্ররোচিত করছে? ডঃ রায়, যদি সম্ভব হয়, এই বিষয় গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবেন কি?

নৃপেন্দ্র নাথ সরকার
চৌদ্দই জানয়ারী ২০০৮ – বাবার উনিশতম মৃত্যুদিবসে